সিএমএম কোর্টে প্রদত্ত ড. আনোয়ার হোসেনের লিখিত জবানবন্দি

মহামান্য আদালত,
আপনার এই বিজ্ঞ আদালতে শপথবাক্য উচ্চারণ করে আমার বক্তব্য পেশ করছি। আমার বক্তব্যের শুরুতেই আমি আমার জাতীয় সঙ্গিতের রচয়িতা বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে যে কবিতাটি রচনা করেছিলেন, তার শেষ কয়েকটি চরণ উচ্চারণ করব। মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে তিনি লিখেছিলেন,
"সত্য যে কঠিন, কঠিনেরে ভালবাসিলাম
সে কখনও করেনা বঞ্চনা"

মহামান্য আদালত,
আপনার সামনে আমি নিঃশঙ্ক চিত্তে কিছু কঠিন সত্য উচ্চারণ করব। কারণ প্রথমত ও প্রধানত সত্য কখনও বঞ্চনা করে না। দ্বিতীয়ত আমি নিঃশঙ্ক, কারণ আমি এমন একটি দেশে জন্মগ্রহণ করেছি যে দেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘাতকের বুলেটের সামনে দাঁড়িয়ে নিঃশঙ্ক চিত্তে জীবন দিয়েছেন। তৃতীয়ত আমি কর্ণেল আবু তাহের, বীর উত্তমের ভ্রাতা, যিনি ফাঁসির মঞ্চে তাঁর অমর বাণী উচ্চারণ করেছেন, নিঃশঙ্ক চিত্তের চেয়ে জীবনে আর বড় কোন সম্পদ নেই। চতুর্থত নিঃশঙ্ক চিত্তে কঠিন সত্য উচ্চারণ করব এ জন্য যে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, যে বিশ্ববিদ্যালয়কে এ দেশের মানুষ জাতির বিবেক বলে মনে করে। এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের কাছ থেকে মানুষ সত্য উচ্চারণ তা যতই কঠিন হোক, তা শুনতে আশা করে।

মহামান্য আদালত,
আমি প্রথমেই একটি বিষয় আপনার সুনজরে আনতে চাই। তা হলো আমাদের বিরুদ্ধে আনীত এ মামলা কোন সাধারণ মামলা নয়। এই মামলার এই কাঠগড়ায় আসামী হিসেবে শুধুমাত্র চারজন শিক্ষক ও উপস্থিত ১ জন ছাত্র এবং অনুপস্থিত ১৪ জন ছাত্র আসামী নয়। আজ এই কাঠগড়ায় আসামী হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে। কাঠগড়ায় আসামী করা হয়েছে জাতির বিবেককে। আপাতত দৃষ্টিতে কাগজে কলমে শাহবাগ থানার একজন পুলিশ অফিসার এ মামলার বাদী। কিন্তু আমরা জানি, দেশবাসী জানে, জাতির বিবেকের বিরুদ্ধে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের বিরুদ্ধে আসল প্রতিপক্ষ কারা। এরা হচ্ছে সেনা গোয়েন্দা সংস্থা ডিজিএফআই, তাই এ মামলার চার্জ গঠনে মুখ্য ভুমিকা পালন করেছে এ সংস্থার সদস্যরা। শুধু তাই নয়, প্রতিনিয়ত তারা উপস্থিত থাকে এই আদালতে। তাই হে মহামান্য বিচারক, আপনার বিজ্ঞ আদালতে কাঠগড়ায় দাড়ানো এই আসামীর বক্তব্য শুধুমাত্র "আমি নির্দোষ এবং শুধু কেন নির্দোষ" এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না।

মহামান্য আদালত,

ইতিহাসে একদিন লেখা হবে, আপনি একটি ঐতিহাসিক মামলায় বিচারিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন। যে মামলায় শুধুমাত্র শিক্ষক কর্তৃক আন্দোলনে ছাত্রদের উস্কানি, তাদের বিক্ষোভ, ভাংচুর, জরুরী অবস্থা ভংগ- ইত্যাদি মূল বিষয় নয়। তার থেকে অনেক গভীরে এই মামলার তাৎপর্য। জাতির বিবেককে হেয়-প্রতিপন্ন করা এবং দলিত করাই এ মামলার মূল লক্ষ্য। সাড়ে চার মাস ধরে কারাভোগের পর গত ৯ ডিসেম্বর থেকে আমাদের বিরুদ্ধে এই মামলা শুরু হয়েছে। চার্জ গঠন, স্বাক্ষী যাদের মধ্যে অসহায় চায়ের দোকানদার, ফেরিওয়ালা, ফুলের দোকানের কর্মচারী, পিয়ন, ভীত-সন্ত্রস্ত্র কন্সটেবল- এদের স্বাক্ষ্য নেয়া হয়েছে। আপনি, বিজ্ঞ আইনজীবিবৃন্দ এবং আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন জন ডীন, একজন বিভাগীয় চেয়ারম্যান ও একজন ছাত্র অনেক ধৈর্য্যে সবকিছু শুনেছি। তাই আপনার প্রতি বিনীত অনুরোধ এ মামলার মুখ্য আসামী হিসেবে আমার বক্তব্য যদি একটু দীর্ঘও হয়, তবুও তা দয়াকরে শুনবেন। আপনার সু-বিচেনার প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে বলছি যদি আমার বক্তব্যের কোন অংশ নথিবদ্ধ করার প্রয়োজন বোধ নাও করেন তবুও প্রথম থেকে যে ধৈর্য্য আপনি দেখিয়েছেন, সেই একই ধৈর্য্যে আমার বক্তব্য আপনি শুনবেন। কারণ বিনীতভাবে বলছি দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থেই আমি তা বলব। একটি বিচার শুধুমাত্র সাজা ও খালাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রতিটি বিচার থেকে আমাদের প্রত্যেকের শিক্ষণীয় আছে।

মহামান্য আদালত,

আমি আজ স্মরণ করছি ঐতিহাসিক আরেকটি মামলার কথা যেটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৭৬ সালে জেনারেল জিয়াউর রহমানের সামরিক শাসন আমলে। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে অনুষ্ঠিত একটি গোপন মামলা। রাষ্ট্র বনাম কর্ণেল তাহের গং নামে পরিচিত সেই মামলায় কর্ণেল তাহের, বীরউত্তম সহ ৩৪ জনের মধ্যে আমিও একজন আসামী ছিলাম। কাঁটাতার ঘেরা একটি অপরিসর বেষ্টনিতে হ্যান্ডকাফ পরা অবস্থায় আমাদের রাখা হত। তার বাইরে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট বিশেষ ট্রাইবুনাল ও আমাদের আইনজীবিরা বসতেন। কারাগারের অভ্যন্তরে উদ্যত অস্ত্র হাতে এই তথাকথিত আদালত প্রহরায় রাখা হয়েছিল আর্মড ব্যাটেলিয়ান। জেনারেল জিয়া সেদিন কর্ণেল তাহের ও মেজর জলিল এই সেক্টর কমান্ডার সহ বাকি সকল মুক্তিযোদ্ধার বিরুদ্ধে এই ট্রাইবুন্যালের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেছিলেন ব্রিগেডিয়া ইউসুফ হায়দারকে, যে ব্যক্তিটি ১৯৭১ সালে ঢাকায় অবস্থান করেও মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয় নি, পাকিস্তানিদের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন, সেই গোপন মামলায় কর্ণেল তাহের জবানবন্দি দিয়েছিলেন বার বার ইউসুফ হায়দার কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়েও। আমাদের প্রধান আইনজীবি বাংলার এককালীন মুখ্য মন্ত্রী আতাউর রহমান খান সেদিন বলেছিলেন, বিজ্ঞ আদালত কর্ণেল তাহেরকে বলতে দিন। তিনি এই মামলার মুখ্য আসামী। কি আশ্চর্য, ১৯৭৬ এর সেই গোপন মামলার ৩১ বছর পর আজকের এই মামলায় তারই ভ্রাতা এই আমি মুখ্য আসামী। কর্ণেল তাহের সেদিন ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান ইউসুফ হায়দার যেন জেনারেল জিয়া ও তার ডিজিএফআই-এর রক্ত চক্ষু উপেক্ষা করে ন্যায় ও সত্যের পক্ষে অবস্থান নেন তার আহ্বান জানিয়েছিলেন। উল্লেখ

করেছিলেন, আর একটি ঐতিহাসিক মামলার কথা। কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রো, সামরিক স্বৈরশাসক জেনারেল বাতিস্তার মানকাডা দূর্গে অভিযান চালিয়েছিলেন। সেই অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল। জেনারেল বাতিস্তা ক্যাস্ট্রোর বিরুদ্ধে গোপন বিচার করেছিল। সেই মামলার বিচারকের উদ্দেশ্যে ফিদেল তার উদ্দিপ্ত ভাষণে সেই একই আহ্বান জানিয়েছিলেন যেন তিনি বাতিস্তার রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে ন্যায়ের দন্ড উর্ধ্বে তুলে ধরেন। সৌভাগ্য ক্যাস্ট্রোর, সৌভাগ্য কিউবার জনগণের। সেই বিচারক সেদিন সত্যের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। সসম্মানে মুক্তি দিয়েছিলেন ক্যাস্ট্রোকে। আর যেদিন ফিদেল ক্যাস্ট্রো ও বিপ্লবী চে' গুয়েভারার নেতৃত্বে বিপ্লবী বাহিনী বিজয়ীর বেশে হাভানায় প্রবেশ করেছিল, বাতিস্তা পলায়ন করেছিল, সেদিন ক্যাস্ট্রো তার প্রথম ডিক্রিতে সেই বিচারককে সম্মান জানিয়েছিলেন, তাঁকে কিউবার প্রথম সাংবিধানিক রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করে। ফিদেল ক্যাস্ট্রো আজও বেঁচে আছেন শুধুমাত্র ক্যান্সারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে নয়, বর্তমান পৃথিবীর উগ্র পরাশক্তি মার্কিন শাসনগোষ্ঠীকে সার্থকভাবে মোকাবেলা করে। হে মহান বিপ্লবী ফিদেল, আজ বাংলাদেশের একজন বিবেক বন্দী শিক্ষক আপনাকে স্মরণ করে সাহসে উদ্দিপ্ত হচ্ছে, যে সাহস আপনি ছড়িয়ে দিয়েছেন শুধু সারা ল্যাটিন আমেরিকাতে নয়, খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ সারা পৃথিবীর তরুণ-তরুণীদের মধ্যে।

মহামান্য আদালত,

দুভার্গ্য কর্ণেল তাহেরের, দুর্ভাগ্য বাংলার দুঃখি মানুষের, ব্রিগেডিয়ার ইউসুফ হায়দার, জেনারেল জিয়া ও তার গোয়েন্দা সংস্থার নির্দেশনার বাইরে যেতে পারেননি। তাহেরও তা বুঝেছিলেন। তাই তার জবানবন্দীতে বলেছিলেন, এ বিচার তো প্রহসন, জিয়ার নির্দেশে বিচারের রায় তো লেখা হয়ে গেছে ডিজিএফআই হেড কোয়ার্টারে। সেদিন আমাদের আইনজীবি, আতাউর রহমান খান, আব্দুর রউফ, যিনি পরে বিচারপতি হয়েছিলেন, এ্যাডভোকেট জুলমত আলী খান, কে, জেড, আলম, গাজীউল হক সহ অন্যান্য আইনজীবিরা যুক্তি দিয়ে সাজানো প্রহসনের মামলার অসাড়তা প্রমান করেছিলেন। আতাউর রহমান খান বলেছিলেন, "বিজ্ঞ আদালত, রাজা যদি বিনা অপরাধে প্রজাকে হত্যা করে, তবে রাজা এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যে, প্রজাও রাজাকে হত্যা করতে পারে"। কিন্তু বিচারের বাণী সেদিন নিভৃতে কেঁদেছিল। ইউসুফ হায়দার জিয়া কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে দ্রুত পাঠ করে গিয়েছেলেন কার কত বছর সাজা। সবার শেষে তাহেরের মৃত্যুদন্ড ঘোষণা করে তাহেরের ভাষায় বেত্রাহত কুকুরের মত দ্রুত আদালতকক্ষ ত্যাগ করেছিলেন। সরকারি পিপি এটিএম আফজাল যিনি পরে প্রধান বিচারপতি হয়েছিলেন, তিনি নিজে কারও মৃত্যুদন্ড চাননি। কারণ তাহের ও তার সহকর্মীদের বিরুদ্ধে যে চার্জ গঠন করা হয়েছিল তাতে মৃত্যুদন্ড দেয়া যায়না। তাহেরের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার ১০ দিন পরে এক সামরিক অর্ডিন্যান্স দ্বারা পেছন থেকে কার্যকর আইন দ্বারা এই মৃত্যুদন্ডকে বৈধতা দিয়েছিলেন জেনারেল জিয়া। রায় ঘোষণার ৭২ ঘন্টার মধ্যে জিয়া তার জীবনদাতা কর্ণেল তাহেরকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করেছিলেন। আর সেই হত্যাকান্ডের রায়ে জিয়ার রক্তচক্ষুর কাছে অবনত মস্তকে সই করেছিলেন দেশের প্রধান বিচারপতি ও চিফ মার্শাল ল' এ্যাডমিনিস্ট্রেটর সায়েম। '৭৬-এর ২১ জুলাই রাতে কী অপূর্ব মহিমায়, কী গৌরবে, কী সাহসে অকুতভয় তাহের এগিয়ে

গিয়েছিলেন ফাঁসির মঞ্চের দিকে। মুক্তিযুদ্ধে ১১ নম্বর সেক্টরে অধিনায়ক তাহের সম্মুখ যুদ্ধে তাঁর বাম পা হারিয়েছিলেন। সেদিন সেই রাতে তাহের পরেছিলেন তার নকল পা, পরিধান করেছিলেন তার কাছে সবচেয়ে সুন্দর যে পোশাকটি ছিল সেটি। লাঠি হাতে কারও সাহায্য ছাড়া ফাঁসির মঞ্চে উঠেছিলেন। ঘাতককে তার পবিত্র দেহ স্পর্শ করতে দেননি। ফাঁসির দড়ি পড়াতে দেননি। তিনি চাননি কোন বাঙ্গালী একজন মুক্তিযোদ্ধার গলায় ফাঁসির দড়ি পরিয়ে নিজের হাত কলঙ্কিত করুক। তাই নিজেই গলায় পরেছিলেন ফাঁসির দড়ি। ফাঁসির পূর্ব মুহূর্তে উচ্চারণ করেছিলেন তার সেই অমর বানী "নিঃশঙ্ক চিত্তের চেয়ে জীবনে আর বড় কোন সম্পদ নেই, আমি তার অধিকারী, আমি আমার জাতিকে তা অর্জন করতে ডাক দিয়ে যাই"।

মাহমান্য আদালত,

কি অপরাধ করেছিলাম? গত পহেলা জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার শিক্ষকতার ৩৩ বছর পূর্ণ হয়েছে। শিক্ষক হয়েও গোপন বিচারে প্রায় পাঁচ বছর কারাগারে কাটিয়েছি। তার পরও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনরায় শিক্ষকতায় যোগ দিয়েছি। তা সম্ভব হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম অর্জন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৭৩ আদেশের জন্য, যা বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে উপহার দিয়েছিলেন জাতির বিবেক হিসেবে আমরা যেন স্বাধীনভাবে সত্য উচ্চারণ করতে পারি। আজ ভাবতেও অবাক লাগে যেখানে বিভিন্ন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান আরও স্বাধীনতা চাইছে, সেখানে সরকার এবং কিছু তথা কথিত সুশীল সমাজ জাতির বিবেক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়ত্বশাসনের রক্ষাকবচ ৭৩ আদেশ বাতিল করতে চাইছে। কারাগার থেকে বের হওয়ার পর পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় জাপানের কিয়োতো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রী করেছি প্রথিতযশা বিজ্ঞানী অধ্যাপক কোজি আসাদার তত্ত্বাবধানে। স্বল্পতম সময়ে ডিগ্রী লাভ করেছি। কত সৌভাগ্যবান আমি, ১৯৯৫ সালে প্রফেসর আসাদা তার ছাত্র আমাকে ভিসিটিং প্রফেসর হিসাবে আমন্ত্রন করেছেন সেই বিখ্যাত কিয়োতো বিশ্ববিদ্যালয়ে। ২০০৪ সালে মিয়াজাওয়া দ্বীপে তাঁর সম্মানে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তাঁর প্রাক্তন ছাত্ররা একত্রিত হয়েছিল। বিজ্ঞানীদের সেই মেলায় আমিও আমন্ত্রিত হয়ে সম্মানীত হয়েছি। আমার মনে আছে সেই অনুষ্ঠানের পর অধ্যাপক আসাদা ও আমি একসঙ্গে বেশ কয়েক ঘন্টা কাটিয়েছিলাম Hiroshima Peace Museum *এ। আলোচনা করেছি বিজ্ঞান, দর্শন ও বিশ্ব শান্তি নিয়ে। আমেরিকার বিখ্যাত জার্নাল, জার্নাল অব বায়োলজিক্যাল ক্যামেস্ট্রি তে আমার প্রকাশিত গবেষণা পত্রের জন্য ১৯৮৫ সনের জীববিজ্ঞান শাখার শ্রেষ্ঠ গবেষণা পত্রের ইউজিসি পুরস্কার লাভ করেছি। বিদেশে না থেকে দেশে ফিরেছি। পরে আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় পারডু বিশ্ববিদ্যালয়ে বিখ্যাত বিজ্ঞানী ডিসট্রিংগুয়িস্ট প্রফেসর অব প্ল্যান্ট ফিজিওলজি থমাস কে হজেস এর সাথে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে বন্যা সহনশীল ধান উদ্ভাবনের জন্য জীব বিজ্ঞানের আধুনিকতম জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং গবেষণায় অংশ নিয়েছি। যার ফলশ্রুতিতে আমাদের গবেষণার এক গুরুত্বপূর্ণ আবিস্কার আমেরিকায় পেটেন্ট হয়েছে। ১৯৯৩ সনের জীব বিজ্ঞানে অনন্য সাধারণ*

গবেষণার জন্য বিচারপতি ইব্রাহীম স্বর্ণপদক লাভ করেছি। মহামান্য আদালত, আপনাকে জানাতে চাই যে, কর্ণেল তাহেরের ঐতিহাসিক জবানবন্দীর উপর নির্ভর করে প্রখ্যাত মার্কিন সাংবাদিক লরেন্স লিফৎ শুলজ তার অসাধারণ পুস্তক, "বাংলাদেশ দি আনফিনিসড রেভ্যুলিউশন- তাহের'স লাস্ট টেস্টাম্যান্ট" রচনা করেছিলেন। প্রফেসর হজেস আমার কাছ থেকে সেই পুস্তকটির কথা শুনে ইউনিভার্সিটি অব নটেরডেম এর লাইব্রেরি থেকে তা সংগ্রহ করে পাঠ করেছিলেন। আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে, প্রফেসর হজেস প্রায় ১৪ বছর পরও তার বাংলাদেশের এই বিজ্ঞানীর কথা ভুলে যাননি। আমেরিকান সোসাইটি অব প্লান্ট বায়োলজিস্ট এর পক্ষ থেকে আমার এবং আমার বন্দী সহকর্মীদের মুক্তি চেয়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টার নিকট পত্র পাঠিয়েছেন। অনুরূপ পত্র পাঠান মার্কিন সিনেটর এ্যাডওয়ার্ড কেনেডি যিনি ১৯৭১ সালে নিক্সন-কিসিঞ্জার মার্কিন নীতির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ অবস্থান নিয়ে মুক্তাঞ্চল সফর করেছেন এবং ১৯৭২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে বটগাছটি রোপন করেছিলেন। ২০০৭ সালের অগাস্ট মাসে আন্তর্জাতিক জার্নাল ফুড কন্ট্রোল-এ ফলমুল, শাক-সব্জী ও খাদ্য সামগ্রীতে থেকে যাওয়া বিষাক্ত কীটনাশক সনাক্ত করার এক সহজ পদ্ধতি যা আমি ২০০৪ সালে জাপান এ্যাডভান্সড ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজিতে জাপানি বিজ্ঞানীদের সাথে উদ্ভাবন করেছিলাম, তা প্রকাশিত হয়েছে। আমি বিনীতভাবে উপরের কথাগুলো শুধু একারণে উল্লেখ করছি, যাতে বিজ্ঞ আদালত একজন শিক্ষক ও বিজ্ঞানী হিসেবে আমার সম্পর্কে একটি ধারনা লাভ করতে পারেন। কারন স্বৈরশাসক এবং তাদের স্তাবকেরা অনেক সময় ঢালাওভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের এই বলে কটাক্ষ করেন যে, আমরা শুধু রাজনীতি করি। মহামান্য আদালত, আমার গায়ে সেনা ইউনিফরম নেই। আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৩ আদেশ আমাকে রাজনীতি বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করতে বাঁধা দেয় না। কিন্তু ইউনিফরম পরে শুধু দেশে নয় বিদেশেও রাজনীতি করে বেড়াচ্ছেন। ঘোড়াকে আকাশে উড়াচ্ছেন, রাজা মরতে পারেন, তিনি মারা যেতে পারেন- এসব মন্তব্য করে ভীত-সন্ত্রস্ত এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতে ঠেলে দিচ্ছেন। ট্রাস্ট ব্যাংকে অনিয়ম করে অসত্য বক্তব্য রেখেছেন, চাকুরীবিধি লংঘন করে তা আপনিও নিশ্চয়ই জানেন। বিজ্ঞ বিচারক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনার যে বিভাগ ছিল সেই আইন বিভাগে গত তিন বছর ধরে আমি একজন আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে জেনেটিকস্, ক্রিমিনাল বিহেভিয়ার এন্ড জুরিসপ্রুডেন্স এর উপর বক্তৃতা দিয়ে আসছি। আমার শিক্ষকতার জীবনে কোন একাডেমিক কাজে কোন শৈথিল্য দেখাইনি। আপনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, আপনিও জানেন আমরা শিক্ষকেরা ছাত্রদের পিতা ও অভিভাবকের মত। বিপন্ন ছাত্রদের পাশে দাঁড়ানোকে আমরা কর্তব্য জ্ঞান করি এটা নতুন নয়। ১৯৯০ সালে এরশাদ সামরিক স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে আজকের রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন যিনি সেই সময় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ছিলেন, তার নেতৃত্বে শুধুমাত্র জরুরী অবস্থা ভংগ নয় কারফিউ ভেঙ্গে আমরা শিক্ষকেরা ছাত্র ছাত্রীদের সাথে রাস্তায় নেমে এসেছি। বিগত জোট সরকারের আমলে যখন রাতের অন্ধকারে পুলিশ শামসুন্নাহার হলে ঢুকে ছাত্রীদের লাঞ্চিত করেছিল। ১৮ জন ছাত্রী, যার মধ্যে আমার বিভাগের একজন ছাত্রীও ছিল- তাদের গভীর রাতে ধরে নিয়ে রমনা থানার হাজতে ভরেছিল, তখনও বিপন্ন ছাত্রী ও তাদের পাশে আন্দোলনরত ছাত্রদের পুলিশি আক্রমন

থেকে বাঁচানোর জন্য আমরা শিক্ষকেরা রাস্তায় নেমে এসেছিলাম। এমনি ঘটনায় সেই কুখ্যাত পুলিশ অফিসার কহিনূরের নির্দেশে সম্পূর্ণ বিনা উস্কানিতে পুলিশের লাঠির আঘাতে আমার হাঁটু ভেঙ্গে গিয়েছিল। সাড়ে তিন মাস আমি শয্যাশায়ী ছিলাম। কিন্তু তখন সেই ঘটনায় তৎকালীন উপাচার্যকে পদত্যাদ করতে হয়েছিল। কোন শিক্ষককে গ্রেফতার করা হয়নি। অন্যদিকে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা আমার বাসায় এসে আমাকে দেখে গিয়েছিলেন। আমার সুষ্ঠু চিকিৎসার জন্য দেশের শ্রেষ্ঠ অর্থপেডিক সার্জন অধ্যাপক রুহুল হককে পাঠিয়েছিলেন আমার শয্যা পাশে।

গত ২০ আগস্ট খেলার মাঠে আমাদের ছাত্র আক্রান্ত হয়েছিল সেনা সদস্যের হাতে। তারা অপমানিত হয়েছিল এবং বিক্ষুদ্ধ হয়েছিল। এখানে বলে রাখি, খেলার মাঠের পাশে জিমনেসিয়াম, যেখানে ১১ জানুয়ারি থেকে ৪৬ তম ইন্ডিপেনডেন্ট ইনফেন্ট্রি ব্রিগেডের একটি ইউনিট অবস্থান করছিল- সেটি ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক শিক্ষার জন্য ব্যবহৃত হত। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীরা বাধ্যতামূলকভাবে, একাডেমিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এখানে আসত। সেখানেই তাদের হাজিরাও নেয়া হত। কিন্তু সেনাবাহিনী দীর্ঘ আট মাস ধরে সেখানে অবস্থানের কারণে তাদের সে কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। ২০ আগস্টের ঘটনার প্রায় ১ মাস পূর্বে ৪৬ তম ইনফেন্ট্রি ব্রিগেড অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হাকিমের সাথে আমার দেখা হয়েছিল খেলার মাঠের গ্যালারীর দোতলায় অফিসার্স ফিল্ড মেসে। উপাচার্যসহ ডীন ও আরও কয়েকজন শিক্ষককে মধ্যাহ্ন ভোজে তারা আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এই সুযোগে আমি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হাকিমকে বলেছিলাম সেনা ক্যাম্পটি সরিয়ে নিতে। কারণ ছাত্র-ছাত্রীরা জিমনেসিয়াম ব্যবহার করতে পারছিল না বলে তাদের একাডেমিক কর্মসূচীতেই অসুবিধা হচ্ছিল। ব্রিগেডিয়ার হাকিম সব শুনে বলেছিলেন, অতি দ্রুত তা তারা সরিয়ে নিবেন। ভোজন পরবর্তী তার বক্তৃতায় তা উল্লেখও করেছিলেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় বর্তমান উপাচার্য তার সমাপনী বক্তৃতায় সেনাক্যাম্প সরাবার কোন প্রয়োজন নেই বলে মত দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, ২১ ফেব্রুয়ারিতে এই জিমনেসিয়ামটি নিয়ন্ত্রণ কক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হত। গত একুশে ফেব্রুয়ারীর প্রাক্কালে আমি উপাচর্যসহ সকল বিশ্ববিদ্যালয় কর্মকর্তাকে বলেছিলাম, তারা যেন সামরিক উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানান কিন্তু তারা কান দেননি। বাস্তব সত্য হল, জোট সরকারের ক্রিড়ানক এই সব পদাধিকারীদের সেই নৈতিক সাহস ছিল না, সেনা শাসকদের সামনে বাস্তব সমস্যাগুলো তুলে ধরার। উপাচার্য যে সেনাক্যাম্প অন্যত্র সরিয়ে নিতে বলতেই সাহস পাবেন না, একথাও আমি মধ্যাহ্ন ভোজের দিন ব্রিগেডিয়ার হাকিমকে বলেছিলাম। আমার পরামর্শমত সেনাক্যাম্পটি সময়ে সরিয়ে নিলে ২০ আগস্টের দুঃখজনক ঘটনাও ঘটত না।

মহামান্য আদালত,

সেনা সদস্যদের হাতে লাঞ্চিত হওয়ার ঘটনায় ছাত্ররা বিক্ষুদ্ধ হয়েছিল। বিক্ষুদ্ধ ছাত্রদের উপর আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নগ্ন হামলায় বহু ছাত্র আহত হয়েছিল, রক্তাক্ত হয়েছিল। আমিসহ বহু শিক্ষক ছুটে গিয়েছিলেন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। আমাদের ভারপ্রাপ্ত

উপাচার্য অধ্যাপক ইউসুফ হায়দার সেখানে ঘোষণা করেছিলেন "এখন বিপন্ন ছাত্রদের পাশে দাঁড়ানোই আমাদের একমাত্র কর্তব্য"। পুলিশের হাতে তিনি নিজেও আহত হয়েছিলেন। এঘটনা থেকেই বোঝা যায়, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কত বেপোরোয়া আচরণ করেছিল সেদিন। মহামান্য আদালত, অন্যান্য বারের মত ২০ আগস্ট এবং তৎপরবর্তী ঘটনায় শিক্ষকেরা ছাত্রদের সাথে কোন বিক্ষোভে অংশ নেননি, রাস্তায় নামেননি। আমরা নানাভাবে চেষ্টা করেছি পরিস্থিতি শান্ত করতে। আমরা ২১ আগস্ট শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে জরুরী সাধারণ সভা করে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে যে প্রস্তাব সমূহ গ্রহণ করেছিলাম, তার কোনটিই সরকার বিরোধী ছিল না। আর প্রস্তাবগুলো আমার বা কোন শিক্ষকের ব্যক্তিগত প্রস্তাব ছিল না। আমরা জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার চেয়েছি। এটিতো নতুন নয়। ১১ জানুয়ারি সেনা সমর্থিত বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার ১ সপ্তাহের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৯ জন শিক্ষক যৌথ স্বাক্ষরে জরুরী অবস্থা অবিলম্বে প্রত্যাহার করে জনগণের মৌলিক অধিকার ফিরিয়ে দিয়ে ৩ মাসের মধ্যে একটি স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান করে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য পত্রিকায় বিবৃতি দিয়েছিলাম। শিক্ষকদের সেই যৌথ বিবৃতির ১ নম্বরে স্বাক্ষরকারী ছিলেন প্রবীন অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। মহামান্য আদালত, আগস্ট ঘটনা তদন্তে বিচারপতি হাবিবুর রহমন খানকে প্রধান করে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করেছিল। বিচারপতি হাবিবুর রহমান শতাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির স্বাক্ষ গ্রহণ করেছিলেন। আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে, কারাবন্দী চার শিক্ষকের স্বাক্ষও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার কাছে প্রদান করে সর্নিবন্ধ অনুরোধ করেছিলেন তদন্ত রিপোর্টটি যেন অবিলম্বে প্রকাশ করা হয়। নিতান্ত পরিতাপের বিষয় সেই রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়নি। কেন হলনা, কাদের ইঙ্গিতে হলনা, তা আমরা জানতে চাই, কারণ তার সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছাত্রদের ভাগ্য জড়িত। মাননীয় বিচারপতি একটি সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে রিপোর্টের মূল বিষয়গুলো তুলে ধরেছিলেন। বলেছিলেন, ২০ আগস্টের ঘটনা আকস্মিক, ২১ আগস্টের ঘটনা স্বতঃস্ফূর্ত, ২২ আগস্টের ক্যাম্পাসের বাইরের ঘটনায় অন্যান্য শক্তির সম্পৃক্ততা থাকতে পারে। শিক্ষক ছাত্রদের বিষয়ে সরকার যেন সর্বোচ্চ ইতিবাচক দৃষ্টি দিয়ে বিষয়টি দেখেন তার জন্য প্রধান উপদেষ্টাকে অনুরোধ করেছিলেন এবং বলেছিলেন অতি অল্প সময়ের মধ্যে তার শুভ ফলাফল পাওয়া যাবে। মহামান্য আদালত, আজ আপনার বিজ্ঞ আদালতে দাবী করছি সেই তদন্ত রিপোর্ট অনতিবিলম্বে প্রকাশ করা হোক।

মহামান্য আদালত,
আগস্টের ঘটনায় আমরা শিক্ষকেরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের বাইরে কোন সমাবেশ বা মিছিলে অংশ নেইনি। কিন্তু আপনি নিজেও তো জানেন, ঢাকার প্রধান সড়কে কতবার কত জঙ্গি মিছিল হয়েছে বর্তমান জরুরী অবস্থায়। কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি, মামলা হয়নি। অন্যদিকে আমাদের শিক্ষক ছাত্রদের বিরুদ্ধে কেমন বৈষম্যমূলক ও প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নেয়া হল, তা দেশবাসী জানে। তাই শিক্ষক ছাত্রদের মুক্তির জন্য, মামলা প্রত্যাহারের জন্য কত আবেদন

নিবেদন হয়েছে। মহামান্য আদালত, ২২ আগস্ট কারফিউ জারির পরদিন ২৩ আগস্ট দুপুরে ডিজিএফআই-এর পক্ষ থেকে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আমিন আরও কয়েকজন অফিসারসহ প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী, ডক্টর হারুন-অর-রশিদ ও আমার সাথে আলোচনার জন্য এসেছিলেন। প্রায় তিন ঘন্টা আলোচনা হল, কারফিউ জারির পর থেকে তাদের সাথে আলোচনা চলাকালে যৌথ বাহিনী যেভাবে হলে হলে এবং ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের আবাসিক এলাকায় এবং আজিজ সুপার মার্কেট, যেখানে ছাত্ররা কারফিউর কারনে আশ্রয় নিয়েছিল- তাদের উপর নির্মম অত্যাচার চালাচ্ছিল, সেই বিষয়গুলো তাদের কাছে তুলে ধরেছি। অনুরোধ করেছি অবিলম্বে তা বন্ধ করতে। তাদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছি, আমরা ছাত্র শিক্ষকেরা আন্তরিক ভাবে চাই সেনাবাহিনী যেন আর ছাত্র-শিক্ষক-জনতার মুখোমুখি না হয়, বিতর্কিত না হয়। আমরা একে অন্যের প্রতিপক্ষ নই। জানিয়েছিলাম, সেনাবাহিনী ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার যেন কোনভাবেই ব্যার্থ না হয় কারন তাতে দেশের মহা সর্বনাশ হবে। তারা সম্পুর্ণভাবে আমাদের সাথে একমত হয়ে আরও উচ্চপর্যায়ে আলোচনার আশ্বাস দিয়ে ফিরে যান। মহামান্য আদালত, নিতান্ত পরিতাপের বিষয় ঐদিন অর্থাৎ ২৩ আগস্ট রাত ১২টার পর পর যৌথ বাহিনী হানা দিয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টাওয়ার ভবনে। আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, দাগী দুস্কৃতকারী নই। কিন্তু সেই গভীর রাতে আমাকে ও আমার সহকর্মী ড. হারুন-অর-রশিদকে গ্রেফতার করা হল, শাহবাগ থানায় নেয়ার নাম করে চোখ বেঁধে নেয়া হল অজ্ঞাত স্থানে, তা আমাকে মনে করিয়ে দিল পাকিস্তানি দখলদার সৈনিকদের আচরণের কথা। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ল সেই একই চন্ডনীতির বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে রাতের বেলা বাড়ি ঘেরাও করে গ্রেফতার করা হয়েছিল প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে। আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারাণ সভার সিদ্ধান্তক্রমে ডিজিএফআই-এর রক্তচক্ষু ও হুমকিকে উপেক্ষা করে প্রতিবাদ কর্মসূচী পালন করেছি। কারণ এ অপ্রয়োজনীয় গ্রেফতারকে গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে আমাদের মনে হয়েছে। পরে একই কায়দায় গ্রেফতার করা হয়েছে প্রাক্তণ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে।

মহামান্য আদালত,
ঐ অজ্ঞাতে স্থানে যেখানে গভীর রাতে আমাকে নেয়া হয়েছিল তা আমার অত্যন্ত পরিচিত। কারণ ১৯৭৬ সালে জেনারেল জিয়ার শাসন আমলে আমি শিক্ষক থাকাকালে আমাকে গ্রেফতার করে সেখানে সাড়ে তিন মাস রাখা হয়েছিল। এবারে রিমান্ডে রাখা হয়েছে সরকারি হিসাবে ৮ দিন, কিন্তু বাস্তবে ১২ দিন। ডিজিএফআই-এর ঐ নির্যাতন কেন্দ্রে রিমান্ডে নেয়ার পর যখন আবার কোর্টে হাজির করা হয়, তখন কি ভয়াবহ শারীরিক ও মানসিক বৈকল্যে ভূক্তভোগী নিপতিত হয়, মহামান্য আদালত তা আপনারা জানেন। তথ্য আদায়ের নামে সেখানে যা যা করা হয়, তার সবই প্রয়োগ করা হয়েছিল বাংলাদেশের বিবেক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই শিক্ষকের প্রতি। প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ডিগ্রীর নির্যাতনমূলক জিজ্ঞাসাবাদ- তার সবই চালানো হয়েছিল। চোখ বন্ধ অবস্থায় দিন রাতের হিসাব ছিল না। মনে পড়ে কালো কাপড়ের পট্টিতে চোখ বাঁধা অবস্থায় আমাকে একজন জিজ্ঞাসা করেছিলেন "বলুন ব্লাক হোল কাকে বলে?" আমি

পদার্থ বিজ্ঞানের ছাত্র নই। তারপরও বলেছিলাম আমার জানামতে মহাকাশে এটি সেই কৃষ্ণ গহ্বর যেখানে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এত বেশি যা এমনকি আপতঃভরহীন, আলোকে পর্যন্ত শুষে নেয়। তারা বলেছিলেন, আপনি সেই ব্লাক হোলে আছেন। মহামান্য আদালত, এই ব্লাক হোলে শুধুমাত্র চোখ বেঁধে দৃশ্যমান আলো কেড়ে নেয়া হয় না, এখানে হ্যারি পটার উপাখ্যানের আজকাবান দূর্গের যে ডিমেন্টর দের কথা বলা হয়েছে, তারা শুষে নেয় মানুষের আত্মাকে। কারাগারে থাকার কারণে পড়বার জন্য আমার মেয়ে দিপান্বিতা আমাকে হ্যারি পটারের উপাখ্যানগুলো পাঠায়। রচয়িতা জে.কে.রওলিং লিখেছেন "The dementors suck the hope and happiness. They suck the soul". *ব্লাক হোল-এ তাই তারা করতে চেষ্টা করেছিল। মহামান্য আদালত, আজ শপথ উচ্চারণ করে আপনাকে এবং দেশবাসীকে জানাচ্ছি, তারা সম্পুর্ণ ব্যার্থ হয়েছিল। তারা আমার আশা-ভরসা-সুখ ও স্বপ্নকে শুষে নিতে পারেনি। পারেনি আমার আত্মাকে শুষে নিতে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিঃশঙ্ক চিত্ত এই শিক্ষক এই আমি তাদের প্রশ্ন করেছি, একটি স্বাধীন দেশের সেনা গোয়েন্দা বাহিনীর সদস্য আপনারা। কেন এই বিশুদ্ধ চিত্তের মানুষটিকে ধরে নিয়ে এসেছেন, যে কোন অন্যায় করেনি। আমাকে হত্যা করতে পারেন কিন্তু ভাঙ্গতে পারবেন না। আর সেই চেষ্টাইবা কেন করবেন। আপনাদের তো কর্তব্য হচ্ছে আমার মত নীতি নিষ্ঠ বিশুদ্ধ সত্বাকে পরম যত্নে রক্ষা করা। তাদের বলেছি, দেশের গরীব জনসাধারণের পয়সায় আপনাদের পোষা হচ্ছে, কিন্তু দেশের কোন উপকারটি করেছেন আপনারা। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টের কালো রাত্রিতে সেনাবাহিনীর ষড়যন্ত্রকারীরা যখন জাতির জনক, দেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছিল তার পরিবার পরিজনসহ তখন কোথায় ছিল ডিজিএফআই? কারাগারের অভ্যন্তরে চার জাতীয় নেতাকে সেনা কুচক্রীরা গুলি ও বেয়নেটে যখন নির্মমভাবে হত্যা করল, তখন কোথায় ছিল ডিজিএফআই? জেনারেল জিয়ার নির্দেশে এই গোয়েন্দা সংস্থা কর্ণেল তাহের বীর উত্তমকে হত্যা করেছিল বিচারের নামে প্রহসন করে। প্রশ্ন করেছি ২১ আগস্ট যখন জোট আমলে প্রকাশ্য দিবালোকে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যা করার জন্য গ্রেনেড ও গুলি চালানো হয়েছিল, তখন কোথায় ছিলেন আপনারা? জঙ্গিরা বলেছে, তারা শুধু গ্রেনেড ছুড়েছিল, গুলি করেনি। গাড়িতে এসে গুলি করে দ্রুত করা চলে গেল, সে রহস্যতো উদঘাটন আজও হলনা। সেই নৃশংস নারকীয় ঘটনায় অলৌকিক ভাবে বেঁচে গিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু কন্যা। কিন্তু আইভি রহমানসহ ২৪ জন মানুষ করুণ মৃত্যু বরণ করেছিলেন। তার কোন কুলকিনারা আজও হলনা। তার মূল রহস্য কোথায়, তা কি সচেতন নাগরিকরা বোঝেন না? ৬৩ জেলায় একযোগে জঙ্গি বোমা বর্ষণ হল, কোথায় ছিল ডিজিএফআই? বিশ্বাস করুন মহামান্য আদালত, তারা আমার কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি। বলেছি, আমাকে কেন ধরে এনেছেন? আমিতো সেই পিতা-মাতার সন্তান যারা তাদের ৭ পুত্র ও ২ কন্যাকে মুক্তিযুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। এদের মধ্যে ৪ জন মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বসূচক খেতাব লাভ করেছিলেন। কর্ণেল তাহের বীর উত্তম, আবু ইউসুফ বীর বিক্রম, শাখাওয়াত হোসেন বীর প্রতীক এবং ওয়ারেসাত হোসেন বীর প্রতীক। বাংলাদেশে দ্বিতীয় কোন পরিবার নেই, যেখানে আপন চার ভাই যুদ্ধে বীরত্বসূচক খেতাব লাভ করেছিলেন। জীবনে জানামতে কোন অন্যায় করিনি, আপনাদের কথিত ষড়যন্ত্রতো দূরের কথা।*

মাহামান্য আদালত,

কুসুমেও কীট থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষকেরা নৈতিকভাবে অধঃপতিত হয়েছেন, দূর্নীতি করেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমুর্তিকে মলিন করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেয়ার জন্য শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে বার বার দাবী করেছি। তারাতো সবাই স্বপদে বহাল শুধু আছেন নয়, তাদের সাথেই আপনাদের দেন-দরবার। সাথে সাথে মাহামান্য আদালত, আমি আপনাকে বলব, দেশে দেশে যুগে যুগে চরম প্রতিক্রিয়ার দূর্গেও অশুভ শক্তির পাশাপাশি শুভ শক্তিও আছে। তাই মানব সভ্যতা এখনও টিকে আছে। সেকারনেই মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সুদূর পাকিস্তানের কারাগারে ডিমেন্টররা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করতে পারে নাই। ডিজিএফআই-এর নির্যাতন কেন্দ্রে তেমন শুভ শুক্তির সন্ধান আমি পেয়েছি। মধ্য রাতে কিংবা তারও পরে যারা পরম শ্রদ্ধায় ও সম্ভ্রমে আমার সাথে আলোচনা করেছেন, আমার প্রতি যে নিষ্ঠুর অন্যায় করা হয়েছে, তার জন্য আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। জানতে চেয়েছেন দেশের সমস্যা সমাধানে আমার মতামত। আমি তাদের নাম দিয়েছিলাম মধ্যরাতের স্বপ্নচারীগণ। হে স্বপ্নচারীগণ, আমি এই জবানবন্দীতে আমি তোমাদের পরম কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করছি। তোমাদের পরিচয় জানি না, কারন আমার চোখ বন্ধ ছিল। কিন্তু হৃদয়ে হে বন্ধুরা আমার, তোমাদের স্থান দিয়েছি।

মহামান্য আদালত,

আরেকটি বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তা হলো আমার ক্ষমা প্রার্থনা বিষয়ে। আমি আগেই বলেছি ২০ আগস্ট ছাত্ররা লাঞ্চিত, অপমানিত ও রক্তাক্ত হয়েছিল। ঐতিহ্যবাহী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনচেতা এই ছাত্র-ছাত্রীদের আত্মমর্যাদায় কঠিন আঘাত করা হয়েছিল। তাই বিক্ষুদ্ধ হয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফুর্তভাবে বিক্ষোভ করেছে তারা। ইউনিফরমধারী সেনা সদস্য লাঞ্চিত হয়েছেন। একটি সেনাযান ভস্মিভুত হয়েছে। সেগুলো কারা করেছে তা আমি জানি না। তারপরও ছাত্র বিক্ষোভের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তা হয়েছে, তাই ছাত্রদের অভিভাবক হিসেবে সম্মানিত জোয়ান থেকে শুরু করে সেনাপ্রধান পর্যন্ত সকলের কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলাম। সেনা বাহিনীর আহত মর্যাদাবোধের যেন দ্রুত নিরাময় হয়। রিমান্ডে থাকাকালে আমি নিজে প্রস্তাব করেছিলাম এ বিষয়ে আমি কোর্টে বলব। তারা অবাক হয়েছিল। আমাকে অনুরোধ করেছিলেন, ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সামনে আমার কথাগুলো বললে সেনাবাহিনীর বড় উপকার হবে। সারাদেশে সেনা সদস্যরা তা শুনতে পাবে। ভুল বোঝাবুঝির অবসান হবে। আমি শর্ত দিয়েছিলাম, আমার মত করে আমাকে বলতে দিতে হবে। তারা কথা দিয়েছিলেন তারা তা রক্ষা করবেন। আমার ক্ষমা প্রার্থনা মিডিয়াতে শুনে দেশবাসী হয়তো ভেবেছেন আমাকে চাপ প্রয়োগ করে বাধ্য করে তা করানো হয়েছে। আজ শপথ করে বলছি, পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি জন্মগ্রহণ করেনি যারা কর্ণেল তাহেরের ভাই ড. আনোয়ার হোসেনকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছু বলতে বাধ্য করতে পারে। কিন্তু মহামান্য আদালত, আমার সাথে প্রতারণা করা হয়েছিল। আমার সম্পুর্ণ বক্তব্য প্রচারে বাঁধা দেয়া হয়েছিল। আমার

সেই উক্তি "সেনা সদস্যদের মত শিক্ষক-ছাত্র-নাগরিক-সকলের আত্মমর্যাদা আছে, আর কখনও যেন তাতে আঘাত করা না হয়"- তা প্রচার করা হয়নি। আমার অপর বক্তব্য, "সেনাবাহিনীর মুল দায়িত্ব ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে দেশে অতি দ্রুত একটি গ্রহণযোগ্য, স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহায়তা করা, যাতে নির্বাচিত বেসামরিক সরকারের হাতে দেশের শাসনভার হস্তান্তর করা যায় এবং সেনাবাহিনী গৌরবের সাথে ব্যারাকে ফিরে যেতে পারে"। কিন্তু তা বলার পূর্বেই আমাকে ধাক্কা দিয়ে কোর্টে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। দেশের মঙ্গলের জন্য সেনাবাহিনী যেন ছাত্র-শিক্ষক-জনতার প্রতিপক্ষ হিসেবে আর অবস্থানে না আসে, ছাত্ররা যেন রক্ষা পায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যেন রক্ষা পায় সেই কারণে কোন গ্লানীবোধ না করে একজন শিক্ষকের বিবেক ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নীতিনিষ্ট সবল ও উচ্চতর অবস্থান থেকে আমি সেই ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলাম। কিন্তু মহামান্য আদালত, দেশবাসী জানেন আমার সেই ক্ষমা প্রার্থনাকে পর্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান করা হয়েছে। যদিও আমি জানি সেনা সদস্যদের হৃদয়ে আমার বক্তব্য গভীর দাগ কেটেছিল। আমাকে রিমান্ডে ফেরত নেয়ার পর অধিকাংশ সেনা কর্মকর্তাদের বক্তব্যে আমি তা অনুধাবন করেছি। তারা বলেছিলেন, Sir, you have shown fathomless magnamity". অর্থাৎ আপনি অপরিমেয় বদান্যাতা দেখিয়েছেন। আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি সেনা সদস্যরা সেভাবেই আমার আন্তরিক আহ্বানকে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু কেউ কেউ আমাকে উপহাস করেছিলেন, কেন সাধারণ সেপাহীদের আমি সম্মানিত হিসেবে সম্বোধন করেছি।

মহামান্য আদালত,
সিপাহীদের যদি সম্মানিত না বলি আর কাদের বলব? আমার প্রয়াত ভাই আবু ইউসুফ, বীর বিক্রমের একমাত্র পুত্র সালাউদ্দিন ও তার স্ত্রী অস্ট্রেলিয়া থেকে ছুটে এসেছিল তার অন্তরীন চাচার সাথে দেখা করতে। সাথে নিয়ে এসেছিল ২০০৭ সালে প্রকাশিত William Dalrylmple -এর অসাধারণ পুস্তক "The Last Mughal" ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ, যাকে কার্ল মার্কস অভিহিত করেছিলেন ব্রিটিশ বিরোধী প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ তার উপর লেখা এ পুস্তকে William Dalrylmple লিখেছেন, "In 1857 the Bengal army was the largest modern army in Asia having 1,39000 sepoys. Among them all but 7,796 turned against their British masters". ভেবে দেখুন ১,৩৯০০০ বেঙ্গল আর্মির মধ্যে মাত্র ৭,৭৯৬ জন ছাড়া বাকী সকলে ইংরেজ প্রভুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে অকাতরে জীবন দিয়েছেন। ঢাকার বাহাদুরশাহ পার্কে অগনিত বাঙালী সিপাহীকে সেদিন বিদেশী ইংরেজরা ফাঁসি দিয়েছিল। ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে সর্বপ্রথম বিদ্রোহ করে বাঙ্গালী সিপাহীরা, অফিসাররাও যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু এ কথাও সত্য, কোন কোন অফিসার মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন অধঃস্তন সিপাহীদের চাপে। তারাই আবার স্বাধীনতার পরবর্তীকালে সিপাহীদের হত্যা করেছিলেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের কালরাত্রিতে সেনাবাহিনীর মুষ্টিমেয় কুচক্রিদের হাতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ও পরে কারাগারে জাতীয় চার নেতার হত্যাকান্ডের পর সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে ক্ষমতা ভাগাভাগি নিয়ে কিভাবে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রকারীরা দেশকে ভয়াবহ গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিয়েছিল, সাধারণ সিপাহীদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল একে অন্যের বিরুদ্ধে। দেশের সেই দুঃসময়ে আবার সেই বীর সিপাহীরা ছুটে এসেছিল কর্ণেল তাহেরের কাছে, যদিও সেই ৭২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সেনাবাহিনী থেকে তিনি পদত্যাগ করেছিলেন। তাঁর ঐতিহাসিক পদত্যাগ পত্রে সরকার প্রধান বঙ্গবন্ধুকে সাবধান করে লিখেছিলেন, তিনি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আদলে গড়ে তোলা সেনাবাহিনীর মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী ষড়যন্ত্রীদের পক্ষ থেকে কি ভয়াবহ বিপদ ধেয়ে আসছে। তাই সেই সেনাবাহিনী ছেড়ে তিনি ফিরে যাচ্ছেন জনগণের কাছে, যারা ১৯৭১ সালে তাকে আশ্রয় দিয়েছিল। কর্ণেল তাহেরের নেতৃত্বে ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সিপাহীরা প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করেছিল। চেষ্টা করেছিল বঙ্গবন্ধুর হত্যাকান্ডের পর মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীদের কাছ থেকে দেশকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ফিরিয়ে আনতে। এই সিপাহীদের কারণে দেশ রক্ষা পেয়েছিল দেশ গৃহযুদ্ধের কাছ থেকে। কিন্তু সিপাহীদের দুর্ভাগ্য, তাদের নেতা কর্ণেল তাহেরের দুর্ভাগ্য, যার জীবন তারা রক্ষা করেছিলেন, সেই জিয়াউর রহমানের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে সিপাহীদের অর্জনকে ধুলিস্মাৎ করা হয়েছিল। তাহের এবং পরে শত শত সিপাহীদের হত্যা করেছিলেন জেনারেল জিয়া। মহামান্য আদালত, আরও একটি সত্য আপনার সামনে তুলে ধরতে চাই। মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম বীর সেনানী ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফ, কর্ণেল হায়দার ও কর্ণেল হুদা অভ্যুত্থানি সিপাহীদের হাতে জীবন দেননি। তাহেরের কঠোর নির্দেশ, “কাউকে হত্যা করা যাবে না”- তা অভ্যুত্থানি সিপাহীরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল। কয়েকজন অফিসার হত্যার ঘটনা ঘটেছিল তা ঘটিয়েছিল ষড়যন্ত্রী মুশতাকের সৃষ্ট ঘাতক চক্র যারা যোগাযোগ রাখছিল জেনারেল জিয়ার সাথে। এই জিয়াউর রহমানের ইঙ্গিতেই তার অনুগত কয়েকজন অফিসারের সরাসরি নেতৃত্বে খালেদ, হুদা ও হায়দারকে হত্যা করা হয়েছিল। এরপর জিয়াউর রহমান ও জেনারেল মঞ্জুরের হত্যাকান্ডের সাথেও কোন সিপাহী যুক্ত ছিল না। আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সিপাহীরা এবং ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ অফিসাররা কোন উচ্চাভিলাষিদের হাতিয়ার হিসেবে জনগণের গণতান্ত্রিক শাসনের বিপরীতে কোন অসাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্রে অংশ নেবে না শুধু নয়, জনতার সাথে মিলে তা প্রতিহত করবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার, সেনাবাহিনী, তথাকথিক সুশিল সমাজ এবং কাছের এবং দূরের বিদেশি শক্তিধরেরা এতদিনে নিশ্চয়ই এই বাংলাদেশের মানুষের মনের ভাষাটি পড়তে পেরেছেন। তা হল, যত দরিদ্র, অনাহার, দুঃখ যাতনার মধ্যে থাকুক এদেশের সাধারণ মানুষ একমাত্র প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছাড়া আর অন্য শাসন তা যত নতুন চমকই আসুক- তা গ্রহণ করবে না। জাগো বাংলাদেশের নামে সরকারি প্রচারযন্ত্রে যত প্রচারণাই চলুক, রাষ্ট্রের পয়সায় যত কোটি কোটি এস.এম.এস পাঠানো হোক না কেন, মানুষের মৌলিক অধিকার ফিরিয়ে দিয়ে তাদের সরাসরি অংশগ্রহণে গণতান্ত্রিক সমাজ বিনিমার্ণের ধীর কিন্তু টেকসই পথ ছাড়া অন্য কোন বিকল্প আমাদের সামনে নেই।

মহামান্য আদালত,

আজ দেশবাসী সবার মনে একটি প্রশ্ন, আসলে দেশ চালাচ্ছে কারা? মানুষ মনে করে একটি ভৌতিক অবয়বহীন সরকার দেশ পরিচালনা করছে। দেশে চলছে অঘোষিত সামরিক শাসন এবং সেনাবাহিনীর অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ সেনাবাহিনীর নামে তা করছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার স্বাধীনভাবে তাদের সংবিধান নির্ধারিত কাজ করতে পারছে না। তাই গত একবছরে দেশের এত দুর্গতি। ভুতের পা থাকে পেছনে। তাই দেশে বর্তমান ভুতুরে শাসনে দেশ আগাতে পারছে না সামনের দিকে। ক্রমাগত চলছে পেছন যাত্রা। দেশে চালানো হচ্ছে ভুল এবং ভয়ের শাসন। তাই জনগণের বহু দিনের বহু সংগ্রামের স্বপ্ন হিসেবে যে স্বাধীন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো সৃষ্টি হয়েছিল, সেগুলো কোনটাই বর্তমান জরুরী অবস্থায় ভুল ও ভয়ের শাসনে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে না। তৈরীর সময়ে প্রশ্নবিদ্ধও করা হয়েছে প্রতিষ্ঠানগুলোকে। নির্বাচন কমিশনে কমিশনার ব্রিগেডিয়ার (অবঃ) সাখাওয়াত হোসেনের বিরুদ্ধে সমকাল পত্রিকায় পর পর দুদিন ধরে শিরোনাম সংবাদ প্রকাশিত হল, পার্বত্য চট্টগ্রামের নিঃসহায় আদিবাসীদের জন্য বরাদ্দকৃত ২০ হাজার টন গম আত্মসাতের জন্য তার অকালীন অবসরের। কিন্তু তিনি জামায়াত সমর্থক বলে তাকে বসিয়ে দেয়া হল এই গুরুত্বপূর্ণ কমিশনে। দুদকের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে লেঃ জেঃ (অবঃ) হাসান মশহুদ চৌধুরীকে। ছাত্র জীবনে ইসলামী ছাত্র শিবিরের পূর্বসুরি ইসলামী ছাত্র সংঘের কর্মী ছিলেন তিনি। এই সেনানায়ক অনেক ভাল কথা বলেন কিন্তু টাস্ক ফোর্সের কথায় তার চলতে হয়। ফাইল হাতে দেশের প্রধান বিচারপতির অফিসে তিনি ঢুকে পড়েন। এর সাথে হাই কোর্টের সব রায় সুপ্রিম কোর্টে পাল্টে যাওয়ার সম্পর্কে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রি শেখ হাসিনার অভিযোগ এবং সেকারণে বিচার বিভাগ পৃথক হলেও সুবিচার না পাওয়ার তার আশঙ্কা কিভাবে অবিশ্বাস করবে দেশের নাগরিকেরা।

মহামান্য আদালত,

বিএনপি-জামাত জোট এবং তাদের যুক্ত নানা গোয়েন্দা সংস্থা এবং দলীয়কৃত বেসামরিক প্রশাসনের নীল নকশার নির্বাচনের বিরুদ্ধে জীবন দিল কত সাধারণ মানুষ। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৪ দল ঘোষণা করল ২৩ দফা সংস্কার কর্মসূচী। তারপর মহাজোট হল। সে আন্দোলনের ফসল হিসেবেই এসেছিল ১১ জানুয়ারির সরকার। জাতিসংঘের হুশিয়ারি ছিল সামরিক শাসন জারি হলে শান্তি মিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। তাই এসেছিল সামরিক শাসনের বদলে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার। এ সরকারকে আপামর জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনও জানিয়েছিলেন। আওয়ামী লীগ ও ১৪ দল সমর্থন জানিয়েছিল। তাই বলা যায় শুভ সংস্কার যতটুকু হয়েছে তার প্রধান দাবীদার জনগণ এবং গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক শক্তি। এই সত্য কেউ অস্বিকার করতে পারে না। কিন্তু জনগণ কি দেখল? আন্দোলনে জীবন দিল মানুষ। পুলিশের ট্রাকের নিচে জীবন প্রদীপ নিভে গেল গরীব মজুরের আর ক্ষমতায় এসেই সেনানায়কেরা তাদের কাঁধে নিজেরাই লাগিয়ে নিলেন মেজর জেনারেল, লে. জেনারেল, ও জেনারেলের ব্যাজ। কোন চক্ষু লজ্জাও হলনা তাদের। অন্যদিকে ভুল ও ভয়ের শাসনে দেশে চলছে নিরব দুর্ভিক্ষ। ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ, কেউ কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছে

না। দূনীর্তিও কমেনি, শুধু রেইট বেড়ে গেছে। মনে পড়ল ১৯৭৬ সালে জিয়ার শাসন আমলে ডিজিএফআই-এর নির্যাতন কেন্দ্রে আমার অবস্থানকালে সদ্য প্রয়াত প্রকাশনা শিল্পের পথিকৃত মহাপ্রাণ চিত্তরঞ্জন সাহাকে ধরে নিয়ে আমার পাশের কক্ষে রাখা হয়েছিল। অভিযোগ তিনি ভারতীয় চর। দিন পনের পর চিত্তদা জানালেন, প্রফেসর সাহেব, আগামীকাল আমাকে বাসায় রেখে আসবে। খরচ মোট ৫৬ হাজার। আমি একজন লেকচারার হলেও চিত্তদা আমাকে প্রফেসর-ই সম্বোধন করতেন। সেই '৭৬-এ ৫৬ হাজার টাকা কম ছিল না। শুনতে পাই তারই পরিমাণ এখন পৌছেছে কোটি টাকায়। প্রধান উপদেষ্টার অফিসের প্রায় পাশে, ক্যান্টনমেন্টের অতি নিকটে র‌্যাঙস ভবন ভেঙ্গে পড়ে হতভাগ্য গরীব মজুরদের লাশ দিনের পর দিন ঝুলে থাকল, আমাদের সেনাবাহিনী বা সরকারী কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব হল না, সেই লাশগুলো উদ্ধার করতে। শেষ পর্যন্ত ঐ গরীব মানুষদের আত্মীয় স্বজনরা এসে নিজেরাই সেইসব লাশ উদ্ধার করে নিয়ে গেল। ভেবে দেখুন মহামান্য আদালত, কি সুশাসনেই না চলছে দেশ।

মাহামান্য আদালত,
আমি কারাগারে আসার পূর্বে বেশ কয়েকবার একটি কথা উচ্চারণ করেছি, তা হল "বাঘের পিঠে সওয়ার হলে, তা থেকে আর নামা যায় না"- এই প্রবাদ বাক্যকে আমাদের সেনা নায়কেরা ভুল প্রমান করবেন। কিন্তু বিটিভি-তে এদের অবিরাম বন্দনা, সারা দেশ থেকে প্যারেড গ্রাউন্ডে জড়ো হওয়া স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের সম্মেলনে সেনা প্রধান যে বক্তব্য রেখেছেন এবং একজন ছাত্র বিবিসি-তে যেমন বলেছে, ওই সেনানায়কেরা মনে করে দেশে তারাই একমাত্র সম্পদ ও রক্ষাকর্তা, অন্য কেউ নয়; রাজনীতিবিদদের ঘরে আবদ্ধ রেখে নিজেরা দেবদূত সেজে রাজনীতি করে বেড়াবেন- তা দেখে ও শুনে মানুষের মনে নানা আশঙ্কা। যে পুরোনো চিত্রের সাথে এদেশবাসী অতি পরিচিত, তারই কি পুনরাবৃত্তি ঘটবে আবার? এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, প্রাকৃতিক সিডরের মহাদুর্যোগে সুন্দরবনের হিংস্র বাঘ পর্যন্ত ঠাই নিয়েছিল লোকালয়ে নিঃসহায় মানুষের পাশে। আর এখন যারা বাঘের পিঠে সওয়ার হয়েছেন তারা তো আসল বাঘ নয়, কাগুজে বাঘ। তাই কেউ যেন ভুল না করেন। সিডরের চেয়ে আরও বড় গণমানুষের মহাপ্লাবনের সামনে ভেসে যাওয়ার আগেই তারা যেন সসম্মানে অবতরণ করেন। একমাত্র প্রকৃত গণতান্ত্রিক সরকার সবচাইতে সুষ্ঠুভাবে আমাদের সেনাবাহিনীকে দেশের কাজে এবং কল্যাণ নিয়োজিত করতে পারবে কোন ভবনের হস্তক্ষেপ থাকবে না। এই সেনাবাহিনীকে কাজে লাগানো হবে ধাপে ধাপে দেশের নাগরিকদের দেশ রক্ষায় সক্ষম করে তুলতে। সেনাবাহিনী হবে জনগণের সেনাবাহিনী, রাজনীতিতে এবং গণতান্ত্রিক শাসনে তারা কখনই হস্তক্ষেপ করবে না। বর্তমান একবিংশ শতাব্দিতে অস্ত্রের চাইতেও বড় শক্তি হিসেবে কাজ করবে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ সৃষ্ট একটি সবল ও টেকসই অর্থনীতি। সেই উদ্যোগে নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার এবং ধাপেধাপে গড়ে ওঠা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সেনাবাহিনীকে দেশ রক্ষা এবং দেশ গড়ার কাজে সবচেয়ে সুন্দরভাবে কাজে লাগানো যাবে।

মাহামান্য আদালত,

যুদ্ধাপরাধীদের বিশেষ ট্রাইবুনালে বিচারের দাবীতে আজ সারা জাতি ঐক্যবদ্ধ। কিন্তু ভুতুরে সরকার নির্বিকার। গত ১ বছরে এইসব যুদ্ধাপরাধীদের গায়ে আচর পর্যন্ত লাগেনি। বিভিন্ন সময়ে সামরিক সরকার এবং বিশেষ করে বিগত জামাত-বিএনপি জোট সরকারের আমলে রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে এরা তাদের অবস্থান পাকা করেছে। তারা সে সমাবস্থানে সুরক্ষিতই আছে। বাংলা ভাইদের মদদ দাতা প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র সচিব ওমর ফারুকের কিছুই হয়নি। খাদ্য-ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ সচিব পদে আছেন আয়ুর মিয়া, যাকে ১৯৭১ সালে বরিশাল শহরে রাজাকার হিসেবে ঘোরানো হয়েছিল। রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির মত প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান করা হয়েছে জামায়াতের সদস্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক আব্দুর রবকে। বিসিএসআইআর-এর চেয়ারম্যান মাহমুদুল হাসান জামায়াতের প্রভাবশালী সদস্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জামায়াত সংশ্লিষ্ট দুর্নীতিবাজ, নীতিভ্রষ্ট উপাচার্য ও অন্যান্য পদাধিকারীগণ যথা স্থানেই আছেন। সংবাদপত্র প্রকাশনা শিল্পের মালিকদের বন্দি করে এসব সংবাদ পত্রে কর্মরত হাজার হাজার সাংবাদিকের রুটি রুজির পথ বন্ধ করে তাদের শুকিয়ে মারা হচ্ছে। কিন্তু জামায়াতের কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান যাদের সাথে জঙ্গিদের অর্থসহায়তা দানের কথা সবারই জানা- তাদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না। এ অবস্থায় আজ মনে পড়ছে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের অমর ভাষণের সেই কথাগুলো- "আমার অর্থ দিয়ে অস্ত্র কিনেছি, বহিঃশত্রুর হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আর সে অর্থ ব্যবহৃত হচ্ছে আমার দেশের গরীব দুঃখী মানুষের উপর- তাদের উপর হচ্ছে গুলি"। বঙ্গবন্ধুর সেই উক্তির সঙ্গে সুর মিলিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই শিক্ষক আজ উচ্চারণ করছে লক্ষ্য শহীদদের বিনিময়ে গড়েছি বাংলাদেশের সেনাবাহিনী, আর আজ স্বাধীনতার ৩৬ বছর পর তাকে ব্যবহার করা হচ্ছে বাংলাদেশের বিবেক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দলন করতে আর রক্ষা করতে যুদ্ধাপরাধী ও জামাত চক্রকে। আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা মানুষের অব্যক্ত কথাগুলোকেই তুলে ধরেছি। আর ভুল করবেন না। অবিলম্বে যুদ্ধাপরাধিদের বিচারের জন্য ট্রাইবুন্যাল গঠন করুন। অবিলম্বে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করুন। আগামী ৩ থেকে ৪ মাসের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ঘোষণা করুন। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে অন্তত জামিনে মুক্তি দিন। ২১ আগস্টের বোমা ও গুলি থেকে তিনি যে অলৌকিক ভাবে বেঁচে গিয়েছেন তার একটি গভীর মর্মবানী আছে। তিনি কারাগারে থাকুন অথবা বাইরে থাকুন, বঙ্গবন্ধুর মত বঙ্গবন্ধুর কন্যার নেতৃত্বে দেশের সকল শুভ শক্তি ঐক্যবদ্ধ হবেই গণতান্ত্রিক অভিযাত্রায়। তেমনি বেগম খালেদা জিয়াকেও মুক্তি দিন। তাঁর স্বামী জেনারেল জিয়া তার জীবনদাতা আমার ভাই কর্ণেল তাহেরকে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু স্বামীর অপরাধে আমি তাকে দোষারোপ করব না। '৯০-এর গণঅভ্যুত্থানে আপনি অনমনীয় দৃঢ়তা দেখিয়েছেন, তার জন্য আপনার প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে। আমি বিনয়ের সাথে বেগম খালেদা জিয়ার প্রতি আহ্বান রাখব- কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে আপনি কর্ণেল তাহেরের বিধবা স্ত্রী লুৎফা তাহেরের সাথে দেখা করে স্বামীর ভুলের জন্য দুঃখ প্রকাশ করুন। জাতির জনক

বঙ্গবন্ধুর মৃত্যু দিবস ১৫ আগস্টের কালো দিনে সমারোহে জন্মদিন পালন না করুন। আর যুদ্ধাপরাধী জামায়েত ইসলামের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে গণতন্ত্রের অভিযাত্রায় সামিল হোন। আজ প্রয়োজন জাতির বৃহত্তর স্বার্থে অতীতের ক্ষতগুলো নিরাময়ের, আপনি নিজেও একজন মুক্তিযোদ্ধার বিধবা স্ত্রী। ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার পর ২৭ মার্চ কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর নামে মেজর জিয়ার পুনরায় স্বাধীনতা ঘোষণা সে সময় মানুষকে উদ্দিপ্ত করেছিল। তার যথাযথ মূল্যায়ন এদেশবাসী নিশ্চয় করবে।

মহামান্য আদালত,

আমি আমার ছাত্রদের বিষয়ে কিছু বলতে চাই। আমরা শিক্ষকেরা বিপন্ন ছাত্রদের পাশে দাড়িয়েছিলাম। গভীর পরিতাপের বিষয়, এখনও তারা বিপন্নই আছে। ২০ আগস্ট ঘটনার পরে প্রধান উপদেষ্টার ঘোষণা ছিল নতুন করে ছাত্রদের গ্রেফতার করা হবে না, নতুন মামলা দেয়া হবে না। তারপরও তাদের গ্রেফতারই শুধু নয়, গত ঈদের আগে কারাগারে বন্দি দু'জন ছাত্রকে রিমান্ডে নিয়ে ঈদের দিনে তাদের উপর শারীরিক নির্যাতন চালিয়ে সেনাবাহিনীর গাড়ি পোড়ানোর মামলায় তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ছাত্র শিক্ষকদের জড়াতে চেয়েছে। সবচাইতে ক্ষোভের বিষয় হল, ডিজিএফআই-এর অফিসার যার নাম আজ কারাগারে বন্দিদের মুখে মুখে, সে নিজ হাতে শাহবাগ থানায় এসে ঐ দুজন ছাত্রকে পিটিয়েছে। তাদের খোলাখুলি হুমকি দিয়েছে, তার টেলিফোনে নির্ধারিত হয় কার কতদিন রিমান্ড হবে। স্বাধীন বিচার বিভাগকে উপহাস করে বলেছে, বিচারকেরা নন, তার টেলিফোনে স্থির হবে কার কি সাজা হবে। ভেবে দেখুন মহামান্য আদালত, এই স্বাধীন বাংলাদেশে কি ঘটছে। ইতিমধ্যে নতুন করে ২৫ জন ছাত্রের বিরুদ্ধে মামলাও হয়েছে। এ বিষয়ে আমি জানতে চাই, ২২ আগস্ট কারফিউ জারির পর নিরাপরাধ ছাত্র-ছাত্রী, রিপোর্টার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের উপর যে বর্বর নির্যাতন চালিয়েছিল যৌথ বাহিনী, তাদের বিরুদ্ধে কি কোন মামলা রজু হয়েছে? মহামান্য আদালত, আজ পরিষ্কারভাবে সরকারকে জানাতে চাই, ছাত্রদের বিরুদ্ধে ঐসব মামলা অবিলম্বে প্রত্যাহার করুন। বন্দি ছাত্রদের মুক্তি দিন। দেশকে অরাজকতার দিকে ঠেলে দিবেন না। আমাদের ছাত্র-শিক্ষকদের আর অপমান করবেন না। মহামান্য আদালত, আমার পরিবারের সদস্যদের সম্পর্কেও দুটি কথা বলব। বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রী রূপম, Edward Said *-এর বিখ্যাত* Orientalism *বইটি পাঠিয়েছে। লিখেছে "সত্য ও ন্যায়ের পথে আপনার নিঃস্বার্থ পদচারণা অক্ষয় হোক"। বইটি আমি পড়েছি। পশ্চিমা বিশ্বের ভাষায় আমরা* Orient*এর মানুষ। তারা* Occidental *এবং আমরা* Oriental*।* Oriental*-দের ওরা যতই অবজ্ঞা করুক তাতে কিছুই আসে যায় না। প্রতিটি সমাজের নিজস্বতা আছে। আছে সবলতা ও দুর্বলতা এবং সমাজ পরিবর্তমান। কেউ উঁচু সংস্কৃতির কেউ নিচুর- এমন ধারণার বিরুদ্ধে* Edward Said *বইটি লিখেছেন। আমাদের* Oriental *সমাজে পরিবারের নিবিড়তা, আবেগ, ভালবাসার কথা বিজ্ঞ বিচারক আপনি নিশ্চই জানেন। সেজন্যই এদেশে রচিত হয়েছে- "ভাইয়ের-মায়ের এতো স্নেহ, কোথায় গেলে পাবে কেহ, ওমা তোমার চরণদুটি বক্ষে আমার ধরি, আমার এদেশেতেই জন্ম*

*যেন, এদেশেতেই মরি"। পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয়, বন্ধু-স্বজন-এদের নিয়েই আমাদের সমাজ। পরিবারের এক সদস্যের বিপদে অন্যরা কিভাবে আক্রান্ত হয়, আত্মত্যাগ করে, বিপদের মোকাবেলা করে তার উজ্জল উদাহরণ আমাদের এই পরিবার। এ পরিবার একসাথে মুক্তিযুদ্ধ করে। কর্ণেল তাহেরকে জিয়ার ষড়যন্ত্র ও হত্যা থেকে বাঁচাতে অন্য ভাইয়েরা বিপ্লবী অভিযানে অংশ নেয়। সাখাওয়াত হোসেন বাহার, বীর প্রতীক বিরোচিত মৃত্যু বরণ করে আরও তিন জন সাথীর সাথে। "আসাদ, বাচ্চু, মাসুদ, হারুন- দিকে দিকে জ্বালাও আগুন"- এই শ্লোগান উচ্চারিত হতো '৭৬ পরবর্তী দিনগুলোতে। আমার ছোট ভাই বাহারের নাম ছিল আসাদ, সেই অভিযানে। আমার সবচেয়ে ছোটভাই ওয়ারেসাত হোসেন বীর প্রতীক ওই একই অভিযানে গুরুতর আহত হয়। তার সাথে আহত হয়েছিল সবুজ। আমার বড়ভাই আবু ইউসুফ বীর বিক্রম অর্থ কষ্টে ভাল চিকিৎসার অভাবে মৃত্যু বরণ করেছেন। আমার ভাবিরা, ফাতেমা ইউসুফ, লুৎফা তাহের কষ্ট করেছেন কিন্তু কারও কাছে মাথা নত করেননি। এখনও চরম ভয়ভীতির পরিবেশে থেকেও আমার স্ত্রী আয়েশা যেভাবে আমাকে সাহস যুগিয়ে গেছে, ধৈর্য্যশীল হতে বলেছে, স্বামীর বক্তব্য পত্রিকায় প্রকাশ করেছে, ভয় ভীতিকে উপেক্ষা করে, তার জন্য আমি গর্বিত। প্রিয়তমা, তাজমহল গড়ার সাধ্য নেই কিন্তু হৃদয়ের গভীরে তোমার জন্য তারচেয়ে বড় সৌধ গড়ে রেখেছি। আমার পুত্র সানজীব "বাবার সাথে কথোপকথন" নামে প্রবন্ধ লিখেছে পত্রিকায়। প্রচার মাধ্যমে, বিবিসিতে তার নিঃশঙ্ক উচ্চারণ কারাগারে শুধু আমাকে নয়, বন্দি ছাত্র-শিক্ষকদের সাহস যুগিয়েছে। আর দীপান্বিতা আমার কন্যার স্বপ্ন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে সে দেশে ফিরে আসবে। আমি নাম দিয়েছি তাকে হ্যারি পটার উপাখ্যানের হারমায়োনি। আমার দুটি বোন ডালিয়া ও জুলিয়া। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বোন এরা। দুজনই মুক্তিযোদ্ধা। ১৯৭১-এর ১৪ নভেম্বরে যে যুদ্ধে কর্ণেল তাহেরের পা উড়ে গিয়েছিল সেই যুদ্ধে দুটি ফ্লাস্কে চা ও পানি নিয়ে ডালিয়াও যুদ্ধক্ষেত্রে ছিল। আর জুলিয়া সবার ছোট বোন এক আশ্চর্য দৃঢ়তা আছে তার মধ্যে। ভাইয়ের বিপদে সবকিছু নিয়ে ঝাপিয়ে পড়েছে। আমার ভাইবোনদের ছেলে-মেয়েরা দেশে বিদেশে যে যেখানে আছে সেখান থেকেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে কাজ করে যাচ্ছে। সবাই কর্ণেল তাহেরের গৌরবময় ঐতিহ্য অনুসরণ করছে। রাষ্ট্র ও সরকার এই পরিবারের মূল্যায়ন করেনি, রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেয়নি। বীর প্রসবিনী আমার মাতা আশরাফুন্নেসাকে অবশ্য আমার বন্ধু হুমায়ুন আহমেদ তাঁর "আগুনের পরশমনি" বইটি উৎসর্গ করেছেন। এদেশের মানুষের ভালবাসা এই পরিবার পেয়েছে তাতেই আমরা ধন্য হয়েছি। ফিদেল ক্যাস্ট্রো বন্ধু নবেল বিজয়ী গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ ল্যাটিন আমেরিকার বুয়েন্ডিয়া পরিবার নিয়ে রচনা করেছেন তার কালজয়ী উপন্যাস "*One Hundred Years of Solitude" *আমি বিশ্বাস করি তাহের পরিবারকে নিয়ে তেমনি কোন পুস্তক নিশ্চই কোনদিন রচিত হবে। বঙ্গবন্ধু ও তাহেরের মত মহাপ্রাণদের কথা স্মরণ করে বলব, "রক্তে ছিল যত কণা তার, তত জনা সহযোদ্ধা, একদিন হবে আমাদের"। মহামাণ্য আদালত, মৃত্যুকে আমি ভয় পাই না, কারণ বঙ্গবন্ধুর সেই উক্তি "আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের মারতে পারবে না"- তা আমি সব সময় স্মরণ করি। আমরা মরব না, বেঁচে থাকব স্বপ্ন নিয়ে, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন, তাহেরের স্বপ্ন, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ার স্বপ্ন, সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন। স্বপ্ন অবিনাশি, কেউ*

তাকে হত্যা করতে পারে না। আমাদের নতুন প্রজন্মে সেই স্বপ্ন আমরা ছড়িয়ে দেব। আমার প্রিয় কবি জীবনানন্দ দাসের কবিতার চরণ “মরণের হাত ধরে স্বপ্ন ছাড়া কে বাঁচিতে পারে” উচ্চারণ করে মহামান্য আদালত আমি বিশুদ্ধ চিত্তে শপথ করে বলছি আমি নির্দোষ।